اَللّٰه শব্দটি মূলত ঃ اَلْاِلٰهُ ছিল। اِلٰهٌ এর শাব্দিক অর্থ মাবূদ, উপাস্য। বাবে فَتَحَ হতে اَلَهَ يَأْلَهُ اِلٰهًا وَّ اُلُوْهِيَّةً এর অর্থ عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً-

اِلٰهٌ এর শুরুতে اَلِفْ وَلَامْ যোগ হওয়ায় اَلْاِلٰهُ হয়েছে। অতঃপর اِلٰهٌ এর হাম্‌যা বিলোপ করে ইদগাম করায় اَللّٰهُ হয়েছে। এটা বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তার নাম। যার অস্থিত্ব অবধারিত এবং সকল উত্তম গুণে পূর্ণাঙ্গ রূপে গুণান্বিত।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উভয়টি صِفَتِ مُشَبَّه এর ছীগা। رَحِمٌ শব্দমূল হতে উৎপত্তি। অতি দয়ালু। উভয়টির প্রায় একই অর্থ। তবে رَحِيْمٌ এর তুলনায় رَحْمٰنٌ এর মধ্যে একটি বর্ণ বেশী থাকায় এর মধ্যে মূল অর্থের অধিক্যতার গুণ বেশী। কেননা প্রসিদ্ধ আছে – كَثْرَةُ الْمَبَانِىْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِىْ (বর্ণের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতা বুঝায়) এ কারণে رَحْمٰنْ শব্দের দ্বারা উভয় জাগতিক করুণা ও رَحِيْم দ্বারা কেবল পারলৌকিক দয়া উদ্দেশ্য নেয়া হয়। অথবা رَحْمٰنْ ইহলৌকিক জগতে এবং رَحِيْم পরজগতে। কেননা। দুনিয়াতে মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্যে তার দয়া বিদ্যমান। আর পরকালে কেবল মুসলিমদের জন্যে তার দয়া থাকবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে رَحْمٰن শব্দটি رَحِيْم এর তুলনায় عَامْ বা ব্যাপকতা সম্পন্ন।

<u>তারকীব ঃ</u> ب - حَرْفِ جَار - اِسم শব্দটি مُضَاف ,اَللّٰه শব্দটি مَوْصُوف - اَلرَّحْمٰنُ প্রথম সিফত, اَلرَّحِيْم দ্বিতীয় সিফত, موصوف উভয় সিফত মিলে مُضَاف اِلَيه - অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف اِلَيه মিলে - مَجْرُوْر جَار ও مَجْرُوْر মিলে সদা فِعْل বা شِبْهِ فِعْل এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়। উল্লেখ না থাকলে তা উহ্য মানতে হয়। এখানে جَارْ مَجْرُوْر কিসের সাথে مُتَعَلِّق হবে এ বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে। কারো মতে উহ্য শব্দটি فِعل কারো মতো شِبهِ فِعل-এর পর উহ্য শব্দটি শুরুতে না শেষে এ ব্যাপারেও মতবিরোধ, তবে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতে শব্দটি شِبهِ فعل এবং তা শেষেই উহ্য।

اَلْحَمْدُ- ال টি اِسْتِغْرَاق (সামগ্রিকতা) বা جنس (জাতীয়তা) নির্দেশের। আর حَمْد অর্থ প্রশংসা, পরিভাষায় জবানের দ্বারা কারো অর্জিত গুণের কারণে প্রশংসা করা। পক্ষান্তরে مَدْح ও شُكْر অর্থ ও প্রশংসা, তবে مَدْح অর্জিত গুণের কারণে হওয়া শর্ত নয়। বরং অর্জিত বা সৃষ্টি গত যে কোন কারণে হতে পারে। এজন্যে حَمِدتُّ زَيْدًا - مَدَحْتُ زَيْدًا এবং مَدَحْتُ اللُّؤْلُؤَ ইত্যাদি বলা যায়। কিন্তু, حَمِدتُّ اللُّؤْلُؤَ বলা যায়না। কেননা মুক্তার গুণ তার অর্জিত হতে পারেনা। সুতরাং উভয়টি প্রশংসা বোধক হলেও শব্দটি عَام বা ব্যাপকতা সম্পন্ন এবং حَمْد শব্দটি خَاص বা সীমাবদ্ধ। অপরদিকে প্রশংসাবোধক আরেকটি শব্দ হল شُكر এটা করুণালাভের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক শব্দ। এটি حَمْد ও مَدح উভয়টির তুলনায় একদিক দিয়ে খাছ (সীমিত)। কেননা حَمد ও مدح কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু شكر কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে খাস। তবে شُكر এর প্রকাশ যবানের সাথে খাছ নয়। বরং কোন অঙ্গের মাধ্যমে উপকার করার দ্বারাও শুকরিয়া প্রকাশ করা যায়। সুতরাং مَوْرِدْ তথা প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে এটি আম (ব্যাপক)।

এ স্থলে حَمد শব্দের পূর্বে উল্লিখিত الف لا টি اِسْتِغْرَاقِى হলে অর্থ হবে সমস্ত প্রশংসা, অর্থাৎ জগতে যত বস্তুর যত প্রশংসা হতে পারে তা সবই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই। কেননা তিনিই মূলত ঃ সব কিছুকে প্রশংসার উপযোগী করেছেন। সব কিছু তাঁরই অবদান। আর جِنس উদ্দেশ্য নিলে অর্থ হবে– প্রশংসা বলতে যা বুঝে আসে তা আল্লাহরই জন্যে। অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয়টি নিকটবর্তী।

رَبِّ ঃ رَبٌّ শব্দটি কারো কারো মতে صِفَتِ مُشَبَّه এর ছীগা। কারো মতে اسم فاعل এর ছীগা, যা মূলতঃ رَابِبٌ ছিল। অধিকাংশের মতে মাসদার, اسم فاعل এর অর্থে। যেমন- زَيْدٌ عَدْلٌ এর অর্থ زَيْدٌ عَادِلٌ -অর্থাৎ পালনকর্তা, বহুবচন أَرْبَابٌ -পরিভাষায় رَبِّ ঐ সত্বা কে বলে যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার সামগ্রিক প্রয়োজনাদি পূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গতা বিধান করেন। এ অর্থে এটি আল্লাহ্ পাকের জন্যে খাছ। তবে মালিক অর্থে ও ব্যবহৃত হয় যথা - رَبُّ الْمَال (সম্পদের মালিক)।

الْعٰلَمِيْنَ ঃ عَالَمٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ مَا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ (যার দ্বারা স্রষ্টা কে চেনা যায়) আর বিবেক ও চক্ষুস্মান ব্যক্তি মাত্রই সৃষ্টি জগতের সাধারণ হতে সাধারণ একটি বস্তুর মাঝে ও তার স্রষ্টা কে দেখতে পায়। যথা কবির ভাষায়- لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ- تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ وَاحِدٌ

একারণে ব্যাপক অর্থে প্রতিটি সৃষ্টিই عَالَمٌ -পরিভাষায় এক একটি জগতকে عَالَمٌ বলে। এখানে সমগ্র জগত বুঝানের উদ্দেশ্যে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ঃ আল্লাহর প্রশংসা বন্দনার পর গ্রন্থকার সর্বাগ্রে মানুষকে চির সুখ শান্তি ও মহাসফলতা লাভে যাতে সবাই ধন্য হয়, রাহমানুর রাহীমের কল্পনাতীত নায নে'মত হতে বঞ্চিত হয়ে সীমাহীন আযাব ও গযবে নিপতিত না হয় বরং শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়ার প্রয়াস পায় এ সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কল্পে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

قوله اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ ঃ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার পর গ্রন্থকার নবীজী সা. তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম পাঠের মাধ্যমে তাঁকে স্বরণ করেছেন। যা মানবিক বিচারে নিতান্ত জরুরী। কারণ যাদের মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় মিলে, মাখলুক কে খালেকের সাথে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল যাদের একমাত্র জীবন সাধনা তাঁদিগকে স্বরণ না করা অবশ্যই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

قوله اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ঃ উভয়টি প্রায় সমার্থবোধক শব্দ। صَلٰوة সাধারণত রহমত ও কৃপা অর্থে এবং سلام শান্তি অর্থে ব্যবহৃত। رسول অর্থ مُرْسَل (প্রেরিত)। পরিভাষায় যিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ঐশী গ্রন্থ ও নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত তিনি হলেন রাসূল। আর নবী যিনি নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত নয় বরং অন্য রাসূলের শরীয়তে অনুসারী হয়ে আল্লাহপাক কর্তৃক হেদায়েতের জন্য মনোনীত। অধিকাংশ আলিমদের মতে রাসূলের তুলনায় নবী ব্যাপকতা সম্পন্ন (আ'ম)। অর্থাৎ রাসূলের জন্যে নতূন শরীয়ত প্রাপ্ত হওয়া শর্ত, কিন্তু নবীর জন্যে এ শর্ত নয়। সুতরাং সকল রাসূল নবী; কিন্তু সকল নবী রাসূল নন।

قوله مُحَمَّدٌ ঃ محمد অর্থ প্রশংসিত, এ নামটি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নাম। এর পূর্বে এ নামে অন্য কাউকে কখনো নাম রাখা হয়নি। বস্তুতঃ আমাদের নবীজী সা. দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে তিনি ছিলেন احمد। (সর্বাধিক প্রশংসাকারী) আর দুনিয়াতে আবির্ভাবের পর তিনি হয়েছেন محمد (প্রশংসিত)।

قوله اَلشَّيْخُ الْإِمَامُ الخ - الشيخ শব্দটির মূল অর্থ বৃদ্ধ, প্রৌঢ়। পরিভাষায় শিক্ষক, গুরুজন, ধর্মীয় নেতা, শাস্ত্র বিশারদ ইত্যাদিকেও شَيْخ বলে-বহুবচনে شُيُوخ। اَلْإِمَام নেতা, পণ্ডিত, দক্ষ শাস্ত্রিক, বহু বচনে أَئِمَّةٌ- اَلْأَجَلُّ মহান, সুউচ্চাসীন, পরম শ্রদ্ধেয় বহুঃ أَجِلَّاءُ- اَلزَّاهِدُ খোদাভীরু, সংযমী, পার্থিব চাকচিক্য বিরাগী।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الثَّلٰثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ تَدْخُلَانِ فِىْ فَرْضِ الْغُسْلِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) وَالْمَفْرُوْضُ فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ لِمَا رَوَى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخُفَّيْهِ ـ

পবিত্রতা অধ্যায়

অনুবাদ ॥ উযূর ফরয সমূহ ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছে কর তখন স্বীয় মুখমন্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত ও গিরা পর্যন্ত পা ধৌত কর। এবং তোমাদের মাথা মাস্হ কর।" সুতরাং (প্রমাণিত হল যে,) উযূর ফরয হল (চারটি) তিন অঙ্গ ধৌত করা, ও মাথা মাস্হ করা, আমাদের হানাফী তিন ইমাম (হযরত আবু হানীফা, আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ র.) এর মতে উভয় কনুই ও পায়ের গিরা ধৌত করা ফরয হওয়ার হুকুমে শামিল। ইমাম যুফর র. ভিন্নমত পোষণ করেন। মাথা মাস্হের ক্ষেত্রে ফরয হল– নাছিয়া পরিমাণ (মাথার অগ্রভাগ) অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ। কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. কোন এক জনপদের আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে এসে পেশাব করলেন। অতঃপর উযূ করলেন ও মাথার অগ্র ভাগে ও উভয় মোজায় মাস্হ করলেন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পটভূমি ঃ ইসলামী জীবন ধারা মূলতঃ পাঁচ প্রকার বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– ১. عَقَائِد (মৌলিক বিশ্বাস বা আকীদাগত) ২. عِبَادَات (ইবাদত-বন্দেগী, নামায রোযা প্রভৃতি) ৩. مُعَامَلات (লেন দেন ইত্যাদি।) ৪. مُعَاشَرَات وَاٰدَابْ (ব্যবহার বা সামাজিক রীতিনীতি) ৫. مُجَازَاتُ (শাসন বা বিচার ব্যবস্থা)।

১ নং ও ৪ নং টি ফিক্হ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং এদুটি ভিন্ন শাস্ত্রীয়রূপে ভিন্নাকারে গ্রন্থিত হয়েছে। এ কারণে গ্রন্থকার طَهَارَة দ্বারাই স্বীয় গ্রন্থকে শুরু করেছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। এর জন্য طَهَارَة অপরিহার্য। তাছাড়া রাসূল সা. ফরমায়েছেন– اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা অর্ধ ঈমান, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– اَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্রতা অর্জন কারীদেরকে পসন্দ করেন।

قوله اَلطَّهَارَةُ ঃ শব্দটি বাবে نَصَرَ এর মাসদার অর্থ পবিত্রতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা نجاستِ حقيقى و حُكمى তথা প্রকৃত ও বিধানগত নাপাকী হতে পবিত্রতা হওয়াকে طَهَارَة বলে। طهارة এর طَاء বর্ণে হরকতভেদে অর্থের পরিবর্তন হয়। যথা- যবর হলে পবিত্রতা, পেশ হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু, ও যের হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু রাখার পাত্র। طهارة এর সকল শাখা বা প্রকারভেদকে শামিল করার উদ্দেশ্যে শুরুতে اَلِفَ ولامِ اِسْتِغْرَاقِى (সামগ্রিকতাজ্ঞাপক আলিফ ও লাম) যুক্ত হয়েছে।

قوله قُمْتُمْ الخ ঃ উল্লিখিত আয়াতে قُمْتُمْ অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি জাহেরীগণ বলে থাকেন। বরং أَرَدْتُمْ (ইচ্ছা পোষণ করা) উদ্দেশ্য। কারণ বাহ্যত দন্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই পবিত্রতার্জন জরুরী। তাছাড়া প্রতিবারের নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উযূও জরুরী নয়। কারণ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সা. কর্তৃক একই উযূ দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় প্রমাণিত রয়েছে।

قوله فَاغْسِلُوْا ঃ غَسْل (ধৌত করা) শব্দ মূল হতে গঠিত অর্থ– পূর্ণাঙ্গে পানি প্রবাহিত করা। ফোটার নির্ঝরণ ঘটলে তাকে غَسْل বলে। পানি না ঝরলে غسل সাব্যস্ত হবে না। আর পেশ সহকারে غسل অর্থ গোসল বা স্নান করা।

قوله اِلَى الْمَرَافِقِ الخ ঃ مِرْفَقٌ (কনুই) এর বহু বচন مَرَافِق - كَعْبٌ অর্থ উঁচু স্থান, এর থেকে, كَاعِبَة (যুবতী)। আয়াতে কনুই পর্যন্ত ধোয়ার নির্দেশ এসেছে। কনুই ও টাখনুসহ ধুতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুফর (র.)-এর মতে কনুই ও টাখনুর নিম্নাংশ পর্যন্ত ধোয়া জরুরী। এর দলীল হল– اِلَى অব্যয়টি তার পূর্বের বস্তুর শেষ সীমা বুঝায়। যেমন– أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ এর মধ্যে রোযা পালনের শেষ সীমা হল রাত পর্যন্ত। রাত পূর্বের নির্দেশের মধ্যে শামিল নয়। জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামগণের মতে কনুই ও টাখনু সহ ধোয়া জরুরী, তাঁদের মতে উপরোক্ত দলীলের উত্তর এই যে, الى এর ما مَابَعْد ও قَبْل (তথা আগে-পরের বস্তুটি) যদি একই জাতীয় হয় তাহলে পরবর্তীটি পূর্ববর্তী অংশের মধ্যে শামিল হবে নতুবা নয়। যথা– اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسَهَا এর মধ্যে رَاسٌ শব্দটি سَمَكَة তথা মাছ খাওয়ার মধ্যে শামিল। আর এক জাতীয় না হলে দাখিল থাকবে না। যেমন উপরোক্ত আয়াতে দ্রষ্টব্য।

قوله وَاَرْجُلَكُمْ ঃ এর লামে যবর ও যের উভয় কিরাত বিদ্যমান। যবর পড়লে وَاَيْدِيَكُمْ এর উপর عطف হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল হবে। আর এটাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামের অভিমত। এ কিরাতটি হযরত নাফে' ইবনে আমের কাসায়ী ইয়া'কুব, ইমাম হাফ্স প্রমূখ রহেমাহুমুল্লাহু হতে স্বীকৃত। পা ধোয়ার বিষয়টি উপরোক্ত নবীজী (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, ও পরবর্তী উম্মতের আমল দ্বারা ও প্রমাণিত।

আর لام বর্ণে যেরের কিরাত অনুযায়ী এর عَطف, رُؤُوْسِكُمْ এর উপর হয়ে পা মাস্হ করার বিধানে শামিল হয়। যেমনটি রাফেযী সম্প্রদায়ের অভিমত।

এ কিরাত অনুযায়ী আহলে সুন্নতের উত্তর এই যে, উভয়ক্ষেত্রে اَيْدِيَكُمْ এর উপর عطف হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল। যেরটি جَرّجِوَار বা পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণে হয়েছে মাত্র। যা আরবী সাহিত্যে প্রচলিত ও স্বীকৃত।

হিকমত ঃ পা ধোয়ার বিষয়টি মাথা মাস্হের পর উল্লেখের ব্যাপারে কাশ্শাফ গ্রন্থকার এই রহস্য ব্যাক্ত করেন যে, পা ধোয়ার ক্ষেত্রে স্বভাবত মানুষে পানী বেশী ব্যয় করে থাকে, যাতে এমনটি না করা হয় এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন উভয় কিরাতই সহীহ্। যবরের কিরাতটি পায়ে মোজা বিহীন অবস্থায়। আর যেরের কিরাতটি পায়ে মোজা থাকা অবস্থায় প্রজোয্য।

মাথা মাস্হের পরিমান ঃ قوله وَالْمَفْرُوْضُ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ ঃ মাথা মাস্হের পরিমানের আয়াতটি مُجْمَلٌ (অস্পষ্ট) থাকায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী আলিমগনের মতে এক চতুর্থাংশ ফরয। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সামান্যতম এমনকি তিন চুল পরিমান হলে ও যথেষ্ট। অপর দিকে ইমাম মালেক এর মতে সমস্ত মাথা মাস্হ কর ফরয।

হানাফীগনের দলীল ঃ মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি হানাফীণের দলীল। এটা ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমূখ সহীহসূত্রে উল্লেখ করেছেন।

قوله نَاصِيَة ঃ মাথার মোট চারটি অংশ রয়েছে। نَاصِيَة অগ্রভাগ, قَذَال পিছনভাগ ও فَوْدَيْن ডান ও বাম ভাগ।

ফায়েদা ঃ বর্ণিত হাদীস দ্বারা ৫টি বিষয় প্রমাণিত হয়। ১। অন্যের পতিতভূমিতে প্রবেশে জায়েয হওয়া। ২। পেশাব করা জায়েয হওয়া ৩। পেশাব উযূ ভঙ্গ কারী হওয়া, ৪। উযূ নষ্টের পর উযু করা, ও ৫। মোজার ওপর মাস্হ করা।

وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوْءِ وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلٰثِ۔

অনুবাদ ॥ উযূর সুন্নত সমূহ ঃ উযূর সুন্নত হল ১। উযূ ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তিনবার হাত ধৌত করা। ২। উযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া। ৩। মেসওয়াক করা, ৪। গড়গড়াসহ কুলি করা, ৫। নাকে পানি দেওয়া। ৬। উভয় কান মাস্‌হ করা, ৭। দাড়ি খেলাল করা। ৮। আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা। ৯। প্রতি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله سُنَن -سُنَن শব্দটি سُنَّةٌ এর বহুবচন। অর্থ নিয়ম-পদ্ধতি, পন্থা। চাই তা খারাপ হোক বা ভাল। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً....وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

সুন্নাতের সংজ্ঞা ঃ নবী করীম (সা.) যে কাজটি ইবাদতরূপে করেছেন তবে মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন সেটি সুন্নত। সুতরাং অভ্যাসগত কাজ সুন্নতের মধ্যে দাখিল নয়।

নিদ্রা ভঙ্গের পর হাত ধোয়া ঃ قوله غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا জমহুর তথা অধিকাংশ আলিমের মতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর সর্বাগ্রে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধোয়া সুন্নত, চাই দিনে হোক বা রাতে। যেহেতু হাতের দ্বারা পবিত্রতা শুরু করতে হয়; এজন্যে এটাই সর্বাগ্রে হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে দিনের বেলা ঘুম হতে জাগলে মুস্তাহাব, আর রাত্রে ঘুম হতে উঠলে ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যারা কেবল ঢিলা কুলূখ দ্বারা এস্তেঞ্জা করে তাদের জন্যে ওয়াজিব। কারণ ঘুমের কারণে নাপাক স্থানটি আদ্র হওয়ার পর উক্ত স্থানে হাত লেগে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর বাকীদের জন্যে সুন্নত।

قوله وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ الخ অধিকাংশ ইমামের মতে উযুর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া সুন্নাত। ইমাম আহমদ এর মতে ফরয। হযরত রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন- لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى যে আল্লাহর নাম না নেয় তার উযু (পূর্ণাঙ্গ) হয় না। এখানে পূর্ণ ফযীলত লাভ না হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা উযূ সম্পর্কীয় আয়াতে এর উল্লেখ না থাকায় এটাই প্রমান করে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ খাছ নয়। বরং যে কোন উপায়ে আল্লাহর নাম হতে পারে। যেমন মুহীতের ভাষ্য মতে- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কোন কোন বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ পড়ার কথা উল্লেখ আছে। হেদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য মতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

قوله اَلسِّوَاكُ ঃ মেস্‌ওয়াক (দাতন) করা সুন্নত। নবী করীম (সা.ঃ) ফরমায়েছেন لَوْلَا اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর না হলে প্রতি নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (নাসায়ী, ইবনে মাজা প্রভৃতি)

মতভেদ ঃ হানাফীগনের মতে মেসওয়াক করা উযূর সুন্নত, শাফেয়ীগনের মতে নামাযের সুন্নত. ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ধর্মীয় সুন্নত।

উপকারীতা ঃ মেসওয়াক করে উযু করার পর নামায পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী হয়। (আহমদ, ইবনে খুযায়মা, দারকুৎনী ও বায়হাকী। নাহরুল ফায়েকের বর্ণনামতে মেসওয়াকে ৩৬ প্রকার উপকার লাভ হয়। সর্বনিম্নতম উপকার হল দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া। আর সর্বোপরি হল মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত স্মরণ হওয়া।

قوله اَلْمَضْمَضَةُ ঃ مَضْمَضَه অর্থ গড়গড়াসহ কুলি করা। اِسْتِنْشَاق অর্থ নাকে পানি দেয়া। নাকে পানি দেয়ার ধরণ দুইটি। ১। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া, হানাফী মাযহাবে এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত, ২। একবার পানি নিয়ে তা থেকে কুলি করা ও নাকে দেয়া। এভাবে মোট তিনবার পানি নিয়ে উভয়টি আদায় করা। আল্লামা মাযনী (র.) এর বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট এটাই শ্রেয়।

ইমামগণের মতভেদ ঃ অধিকাংশ ইমামের মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যা ২২টি সনদ সূত্রে প্রমাণিত। তবে ইমাম মালেক (র.) এর মতে উভয়টি ফরয।

قوله مَسْحُ الْاُذُنَيْنِ ঃ মাথা মাস্হের অবশিষ্ট পানি দ্বারা উভয় কান মাস্হ করাও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ীও আবু ছাওর (র.) এর মতে নূতন পানি দ্বারা মাস্হ করা সুন্নত। মাস্হকালে কানের পিঠ ও পেটের উঁচুনীচু অংশে হাত ফিরান সুন্নতে শামিল।

قوله وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে দাড়ি খেলাল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, طرفين এর মতে সুন্নতে যায়িদা।

খেলালের তরীকা ঃ ডান হাতের তালুর পিঠ বুকের দিকে রেখে আঙ্গুল গুলো থুতনীর নিচ দিয়ে দাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট করে খেলাল করতে হয়। দাড়ি যদি ঘন না হয় এবং চামড়া দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছান জরুরী। আর ঘন হলে এবং চামড়া দৃষ্টি গোচর না হলে উপর অংশ ধোয়া জরুরী এবং খেলাল করা সুন্নত।

قوله وَتَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ ঃ খেলালের বিধান ও ফযীলত ঃ রাসূল (সা.) ফমায়েছেন – خَلِّلُوا اَصَابِعَكُمْ كَيْ لَا تَتَخَلَّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ তোমরা স্বীয় আঙ্গুল খেলাল কর যাতে তার মধ্যে দোজখের অগ্নি প্রবিষ্ট না হয়।

খেলালের পদ্ধতি ঃ হাতের ক্ষেত্রে এক হাতের পাঞ্জা বা আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে ঘসতে হবে। আর পায়ের ক্ষেত্রে বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম পায়ের কণিষ্ঠা আঙ্গুলে শেষ করতে হবে।

قوله وَتَكْرَارُ الْمَسْحِ ঃ উযূর পূর্ণাঙ্গতার জন্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া সুন্নত। মূলত ঃ একবার ধোয়া ফরয। দুই বার ধোয়া সুন্নত ও তিন বার ধোয়া পূর্ণতাকল্পে সুন্নতে যায়িদা। শায়খ আবু বকরের মতে তিন বারই ফরয।